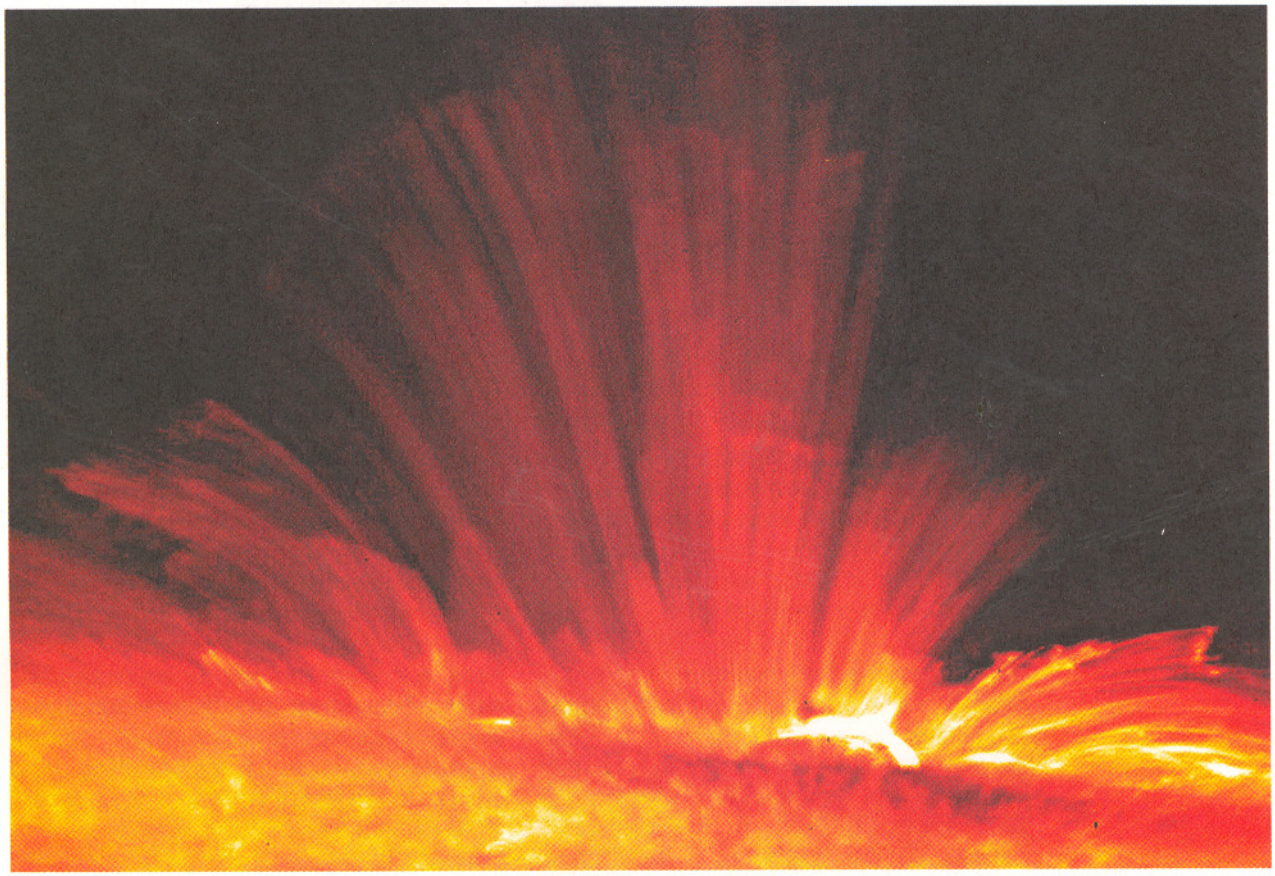

বিক্ষুব্ধ সূর্যের শরীর থেকে বেরচ্ছে সৌরশিখা

ফিরে এসো কলঙ্ক

বি মা ন না থ

শেষ অবধি ঘুম ভাঙল সূর্যদেবতার। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে সূর্যের গায়ে দু'জায়গায় উঠল বেশ বড় বড় ঝড়। বিপুল পরিমাণ সৌরপদার্থ ছিটকে উঠল তার গা থেকে, তার কিছুটা পৃথিবীর দিকেও ধেয়ে এল, আছড়ে পড়ল বায়ুমণ্ডলের ওপর। আর সেই সুবাদে পৃথিবীর এমন কিছু জায়গা থেকে মেরুপ্রভা দেখা গেল, যা মেরু অঞ্চল থেকে অনেক দূরে বলে মেরুপ্রভার সৌন্দর্য হামেশা দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত।

আর এই ঝড়ের সঙ্গেই ফিরে এল সূর্যের কলঙ্ক। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিন্ত হলেন। টানা দু'বছর দুশ্চিন্তার পর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তাঁরা।

হয়তো অনেকে ভাবছেন ঠাট্টা করা হচ্ছে। কলঙ্ক আবার কবে থেকে ভাল খবর হল? তা সে সূর্যেরই হোক আর কোনও লোকেরই হোক। তাছাড়া আজকাল কারও কলঙ্ক নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নাকি?

চরিত্রটি যেহেতু সূর্য, তাই মাথা না ঘামিয়ে উপায় নেই। ২০০৮ সাল থেকে বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে। তন্ন তন্ন করে সূর্যের গায়ে কলঙ্ক খুঁজে খুঁজে তাঁদের অবস্থা নাজেহাল। নানা ধরনের কঠিন অঙ্ক কষে অনেক রকমের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তাঁরা। কিন্তু সবার ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল প্রমাণিত করে সূর্য প্রায় নিষ্কলঙ্ক হয়ে রয়েছিল দু'বছর। এর সঙ্গে গত শীতে ইউরোপ আর আমেরিকায় কড়া ঠান্ডার সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা মিলেমিশে সকলকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল আমাদের সূর্য। অনেক বিজ্ঞানীর মতে নিষ্কলঙ্ক সূর্য নাকি নিস্তেজ হয়, এবং সেই জন্য পৃথিবীতেও শৈত্যের আধিক্য দেখা দিতে পারে। তাই কলঙ্ক আর যার পক্ষেই খারাপ হোক না কেন, সূর্যের পক্ষে মোটেই নয়। এই মুহূর্তে বিজ্ঞানীরা আশা করে বসে আছেন যেন ধীরে ধীরে আগামী কয়েক বছরে আবার সূর্যের কলঙ্কের সংখ্যা বাড়ে। যেন আবার ফিরে আসে তার তেজ।

সূর্যের কলঙ্ক নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন? কলঙ্ক যাকে বলছি সেটাই বা আসলে কী?

আমরা সবাই জানি সূর্য একটি নক্ষত্র, অর্থাৎ যার নিজের আলো তৈরি করার ক্ষমতা আছে। আলো বা শক্তি তৈরি

আপাত-অহেতুক দীর্ঘ একটি নিষ্কলঙ্ক দশা পেরনোর মুখে সূর্য আকস্মিক বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেই স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন বিজ্ঞানীরা। সূর্যকে নতুন করে পড়ার সুযোগটি তাঁরা হারাতে নারাজ।

করার জন্য চাই একটা তপ্ত গ্যাসের গোলক। তার কেন্দ্রের তাপমাত্রা পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট হওয়া চাই। যেমন সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা হল প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সেখানকার গ্যাসের ঘনত্বও খুব বেশি। ভারী জিনিসের উপমা দেবার জন্য যে সিসের উল্লেখ করা হয় তার ঘনত্বের চেয়েও প্রায় দশ গুণ বেশি। এই ঘনত্ব আর তাপমাত্রার জন্য সূর্যের কেন্দ্রে একটা বিশেষ বিক্রিয়া ঘটছে। চারটা প্রোটন (অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্র) মিলে একটা হিলিয়াম পরমাণু কেন্দ্র তৈরি করছে। এটাকে বলা হয় ফিউশন অর্থাৎ পরমাণু সংযোজন। সাধারণ পারমাণবিক বোমায় যা হয়, তার উল্টোটা ঘটছে এই প্রক্রিয়ায়। ভারী পরমাণুর বিভাজন নয়, বরং হালকা পরমাণুর কেন্দ্রগুলো একত্রে এনে জোড়া লাগানো হচ্ছে এখানে।

সূর্যের কলঙ্ক আর ঝড় না থাকলে সূর্যের তেজ যদিও কিছুটা কমে যায়, সেটা আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট নয়।

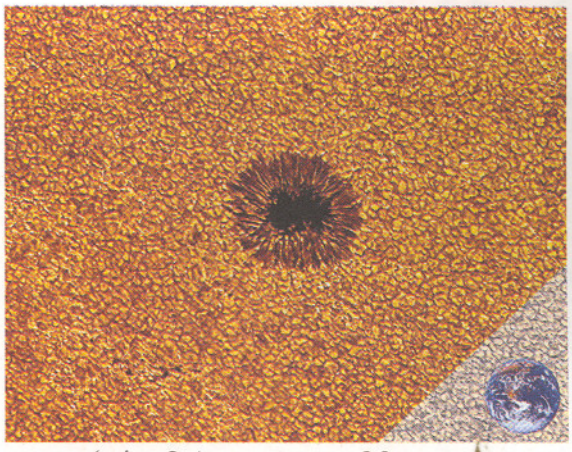

সূর্যপৃষ্ঠে একটি সৌরকলঙ্ক। আয়তনে পৃথিবীর থেকেও বড়

এই বিক্রিয়ার সময় কিছুটা ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সূত্র $E = mc^2$ অনুযায়ী ভর আর শক্তি একই জিনিসের রকমফের। এ ক্ষেত্রে যা হচ্ছে সেটা হল এই: চারটে প্রোটন যোগ করলে যত ভর পাওয়া যেত, একটা হিলিয়াম কেন্দ্রের ভর তার চেয়ে একটু কম। দুইয়ে দুইয়ে মিলে ঠিক চার হচ্ছে না—তার খানিকটা কম। আর ওই বাকি ভরটুকু আলো হয়ে বেরিয়ে আসছে সূর্যের কেন্দ্র থেকে।

প্রথমদিকে এই আলোর শক্তি খুব বেশি থাকে; এগুলো হল গামা রশ্মি, যার শক্তি এক্সরে বা রঞ্জনরশ্মির থেকেও বেশি। ধীরে ধীরে এই আলোর কণা সূর্যের কেন্দ্রের বাইরের স্তরগুলো পেরিয়ে আসে। পথ চলার সময় তার সঙ্গে গ্যাসের কণার ঠোক্কর লাগে। তাই তার চলার পথ হয় মন্থর। এদিকে ওদিকে ধাক্কা খেতে খেতে এই আলোর কণাগুলো যখন সূর্যের একেবারে বাইরের স্তরে এসে পৌঁছয়, ততক্ষণে কয়েক লক্ষ বছর পেরিয়ে গেছে। আর তার শক্তি খুইয়ে, 'গলদঘর্ম' হয়ে এই আলো হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ হলুদ রঙের আলো।

শুধু যে আলোর শক্তিক্ষয় হয় তা নয়, সূর্যের বাইরের স্তর ভেদ করে আসার সময় এই আলো আর একটা কাণ্ড করে বসে। আমরা স্কুলের বইতে পড়েছি যে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাপ মোট তিন রকম উপায়ে যেতে পারে। এক হল পরিবহন—রান্না করার সময় উত্তপ্ত কড়াইয়ে হাত দিলে আমাদের ছ্যাঁকা লাগে, এটা তার উদাহরণ। এখানে কড়াইয়ের পরমাণু একে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে এক জায়গার তাপ অন্য জায়গায় পৌঁছে দেয়। আর একটা উপায় হল বিকিরণ, যখন তাপরশ্মির সাহায্যে তাপ দূরে কোথাও পৌঁছাতে পারে। গরম উনুনের পাশে বসলে এ কারণেই আমাদের গায়ে ওম লাগে। তৃতীয় পন্থা হল পরিচলন। এর একটা উদাহরণ হল যখন পৃথিবীর কোনও জায়গা খুব গরম হয়ে পড়ে, তখন সেখানকার হাওয়া ওপরের দিকে ওঠে, আর সেখানে নিম্নচাপ দেখা দেয়। এখানে গরম গ্যাস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় (নীচ থেকে ওপরে) গিয়ে তাপ পৌঁছে দিচ্ছে।

কলঙ্ক আর যার পক্ষেই খারাপ হোক না কেন, সূর্যের পক্ষে মোটেই নয়। এই মুহূর্তে বিজ্ঞানীরা আশা করে বসে আছেন যেন ধীরে ধীরে আগামী কয়েক বছরে আবার সূর্যের কলঙ্কের সংখ্যা বাড়ে। যেন আবার ফিরে আসে তার তেজ।

সূর্যের কেন্দ্রে তাপ পৌঁছে দেবার কাজ করে। ভেতরের স্তর থেকে বেরিয়ে আসার সময় গ্যাসের কণার সঙ্গে আলোককণাগুলি ধাক্কা খেতে থাকে। পথে চলতে চলতে সে তার কিছুটা শক্তি তাপ রূপে সূর্যের গ্যাসকে বিলিয়ে দেয়। এই সব অঞ্চলে আলো আর গ্যাসের মধ্যে একটা বোঝাপড়া আছে। এর কারণ হল এই যে, এখানকার প্রচণ্ড তাপের জন্য গ্যাসের পক্ষে পরমাণু তৈরি করা সম্ভব নয়—এখানে ইলেকট্রনগুলো যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ায়। আর এই স্বাধীন ইলেকট্রনগুলো আলোকে পুরোপুরি শুষে নেয় না।

কিন্তু সূর্যের বাইরের দিকের গ্যাসের তাপমাত্রা ভেতরের তুলনায় অনেক কম। সূর্যের একেবারে বাইরের স্তরের তাপমাত্রা মাত্র ছয় হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো, সূর্যের কেন্দ্রের গ্যাসের তুলনায় বেশ ঠান্ডাই বলা যায়। এই তাপমাত্রায় গ্যাসের মধ্যে কয়েক ধরনের পরমাণু তৈরি হতে পারে, কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন পাকড়াও করে তাদের বন্দি করে রেখে। আলোর সঙ্গে এই বন্দি ইলেকট্রনগুলোর আচরণই আলাদা—কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরা আলো পুরোপুরি শুষে নেবার চেষ্টা করে। এই শোষণের ফলে গ্যাস খুব গরম হয়ে গিয়ে ওপরের দিকে, অর্থাৎ বাইরের দিকে, উঠতে শুরু করে—আমাদের বায়ুমণ্ডলে যেমন হাওয়া গরম হয়ে ওপরে ওঠে, তার মতো। ওপরে উঠে ঠান্ডা হয়ে আবার নীচে চলে যায়, তার পর আবার ওপরে উঠে আসে। এই ভাবে ওপর-নীচে চলাফেরা করে সূর্যের বাইরের স্তরের গ্যাস। যেন সেখানে প্রতি মুহূর্তে ঝড় উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

এমনটা যে সত্যিই ঘটছে তার চাক্ষুষ প্রমাণ আছে। দূরবীক্ষণে

সূর্যের গঠন

সূর্যের নিজের চারিদিকে ঘোরার গতি সব জায়গায় সমান নয়। সূর্য যদিও তার অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরছে, তার ঘোরার সঙ্গে পৃথিবীর আহ্নিকগতির একটা বড় তফাত আছে। সূর্যের ঘোরার গতিবেগ তার সকল অক্ষাংশে সমান নয়—বিষুবরেখায় তার যে গতিবেগ, মেরুর কাছাকাছি গ্যাস তার চেয়ে ধীরে গতিতে চলে। এর জন্য সূর্যের ভেতরের দিকে চৌম্বক বলরেখার ওপর একটা টানাটানি চলে।

সূর্যকে লক্ষ করলে দেখা যায় তার ওপর দানার মতো বিভিন্ন আকারের দাগ ছড়ানো রয়েছে। যেন অনেকগুলো বেদানার দানা এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়েছে। আরও ভাল করে এবং কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ করে দেখা যায় যে এই দানাগুলো স্থির বসে নেই। কয়েক মিনিট পর পর এক একটা দানা মিলিয়ে গিয়ে সেই জায়গায় অন্য দানা দেখা দিচ্ছে। কোনও দানার মধ্যেকার গ্যাসের গতিবিধি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, সেখানকার গ্যাস আসলে ওঠানামা করছে। অর্থাৎ সেখানে ঝড় উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

আকাশের সব নক্ষত্রে কিন্তু এই রকম ঝড় ওঠে না। যে সব তারা সূর্যের চেয়ে অনেক ভারী এবং যাদের তাপমাত্রা খুব বেশি, তাদের বাইরের স্তরের গ্যাস আলোর কণাকে ভাল করে শুষে নিতে পারে না। এদের ক্ষেত্রে আলোর কণা গ্যাসের পরমাণুদের সঙ্গে ঠোক্কর খেতে খেতে বেরিয়ে আসে। তাই সেই সব তারার বাইরে এমন ঝড় ওঠে না। শুধু সূর্যের মতো বা তার চেয়ে কম তাপমাত্রার (অর্থাৎ তার থেকে কম ভরবিশিষ্ট) নক্ষত্রের গায়েই এমন ঝড় উঠতে দেখা যায়।

সূর্যের গায়ের এই দানাগুলো অবশ্য তার পুরো শরীরটা ঢেকে নেই। কিছু কিছু অংশে গ্যাসের এই ওঠানামা খানিকটা বন্ধ হয়ে থাকে। আটকে থাকে সেখানকার গ্যাসের গতিবিধি। সেই অংশগুলোতে একটা শক্তি কাজ করছে যার ফলে গ্যাস স্বাভাবিক ভাবে ওপরে উঠতে পারে না, কাজেই ভেতরকার তাপও বাইরে এসে ছড়িয়ে দিতে পারে না। ফলে ওই অংশগুলোর তাপমাত্রা থাকে অন্যান্য অংশের তুলনায় কিছুটা কম। যেহেতু কম তাপমাত্রার গ্যাসের ঔজ্জ্বল্য কম, তাই সেই অংশগুলো থেকে আসা আলোও ম্লান হয়। আশপাশের তুলনায় এই অংশগুলো তাই কিছুটা কালো দেখায়। এই কালো অংশগুলোই হল সূর্যের কলঙ্ক।

কিন্তু সূর্যের ওই সব অংশে কী এমন শক্তি রয়েছে যার জন্যে গ্যাসের স্বাভাবিক চলাফেরায় বাধা পড়ে? সেটা হল চৌম্বক শক্তি। শুনে হয়তো অবাক লাগতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সূর্যের মধ্যে আবার চুম্বক কোথায়? কিন্তু একটু ভাবলেই ব্যাপারটা সহজ করে বোঝা যাবে।

চুম্বকের সঙ্গে তড়িৎপ্রবাহের বা ইলেকট্রিক কারেন্টের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। এই দুই শক্তির মধ্যে গলাগলি ভাব; একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কোথাও বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিবর্তন হলে সেখানে চৌম্বক শক্তি দেখা দেয়। আবার কোথাও চুম্বক নিয়ে নাড়াচাড়া করলে সেখানে ইলেকট্রিক কারেন্ট উঁকি মারে। যেমন আমরা সাইকেলের চাকার সঙ্গে চুম্বক লাগিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ তৈরি করতে পারি, জ্বালাতে পারি হেডলাইটের আলো। এই ধরনের ডাইনামো এটাই প্রমাণ করে যে, বিদ্যুৎপ্রবাহ আর চুম্বকের মধ্যে একটা গভীর যোগাযোগ রয়েছে।

এর সঙ্গে আর একটা কথাও ভাবতে হবে। সূর্যের তাপমাত্রা এত বেশি যে, সেখানে গ্যাসের পরমাণুদের অবস্থা বেশ করুণ। এই কারণেই সেখানকার ইলেকট্রনগুলো স্বাধীন হয়ে ঘুরে বেড়ায়, যার কথা আমরা আগে জেনেছি। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। কোনও কিছু গরম করার অর্থ হল, তার মধ্যে যে সব পরমাণু রয়েছে তাদের ছোটাছুটির পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। ঠান্ডা পদার্থে পরমাণুরা জবুথবু হয়ে বসে থাকে, সেজন্য সেই সব জিনিস একটা বিশেষ আকার বজায় রাখতে পারে। তাকে একটু গরম করলে পরমাণুগুলো তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করতে শুরু করে, তখন সেটা হয় তরল। আরও গরম করলে পরমাণুদের ছোটাছুটি বেড়ে যায়, তখন সেই পদার্থ বায়বীয় আকার ধারণ করে।

কিন্তু ধরা যাক এই গ্যাসকে আরও গরম করা হল। তখন তার অবস্থা কী দাঁড়াবে? তাদের মধ্যে ছোটাছুটি এত বেড়ে যাবে যে তখন পরমাণুর ভেতরকার অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে উঠবে। সাধারণত পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটন আর নিউট্রন এই দুই ধরনের কণা থাকে। এদের মধ্যে প্রোটনের বৈদ্যুতিক চার্জ হল ধনাত্মক, আর নিউট্রনের কোনও চার্জ নেই। এই কেন্দ্রের চারিদিকে কিছু

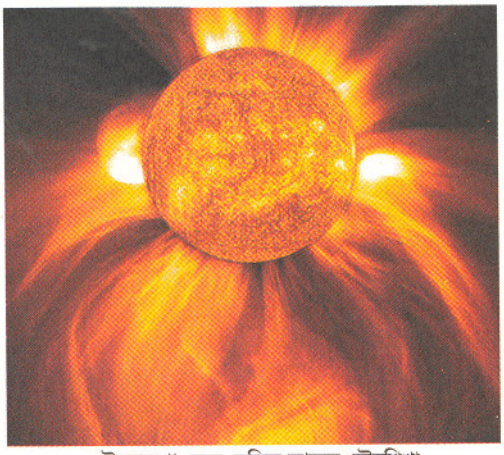

চৌম্বকরেখা বেয়ে বেরিয়ে আসছে সৌরশিখা

ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায়, যাদের বৈদ্যুতিক চার্জ হল ঋণাত্মক। এই দুই বিপরীতধর্মী চার্জের মধ্যে আকর্ষণের জন্য এই কণাগুলো একত্রে থাকে। অর্থাৎ, প্রোটনগুলো বৈদ্যুতিক বলের সাহায্যে ইলেকট্রনগুলোকে ধরে রাখে, এবং পরমাণুটার পরিবার সামলে রাখে।

কিন্তু যখন আশেপাশের পরমাণুগুলো ছোটাছুটি শুরু করে এবং একে অপরকে ধাক্কা দিতে শুরু করে তখন কী হয়? ধরা যাক, বাবা ছেলের হাত ধরে বাজারে বেরিয়েছেন। এমন সময় কোনও কারণে রাস্তায় লেগে গেল দাঙ্গা। তখন সবাই দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করবে। বাবা হয়তো তখন ছেলের হাত ধরে দৌড়তে শুরু করবেন। কিন্তু লোকজনের ছোটাছুটি আরও বেড়ে গেলে এক সময় হয়তো বাবা আর ছেলেকে ধরে রাখতে পারবেন না, দু'জনে কে কোথায় ছিটকে যাবেন কে জানে। সূর্যের ভেতরে প্রচণ্ড তাপমাত্রায় গ্যাসের পরমাণুর ঠিক এই অবস্থা হয়। প্রোটনদের হাতছাড়া হয়ে ইলেকট্রনগুলো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে। আর এই ধরনের বৈদ্যুতিক চার্জসহ কণার চলাফেরার নামই তো তড়িৎপ্রবাহ। আর যেখানে তড়িৎপ্রবাহ রয়েছে, সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র থাকতে বাধ্য।

অবশ্য এই চৌম্বক ক্ষেত্র স্থির নয়—প্রতি মুহূর্তে এর পরিবর্তন হচ্ছে। কারণ ইলেকট্রনগুলোর গতিবিধি সব সময় বদলাচ্ছে। আর সূর্যের সব অংশে এই চৌম্বক শক্তির পরিমাণও

সূর্যের গায়ে দু'জায়গায় উঠল বেশ বড় বড় ঝড়। বিপুল পরিমাণ সৌরপদার্থ ছিটকে উঠল তার গা থেকে, তার কিছুটা পৃথিবীর দিকেও ধেয়ে এল, আছড়ে পড়ল বায়ুমণ্ডলের ওপর।

সূর্যের বাইরের দিকের গ্যাসের তাপমাত্রা ভেতরের তুলনায় অনেক কম। সূর্যের একেবারে বাইরের স্তরের তাপমাত্রা মাত্র ছয় হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো, সূর্যের কেন্দ্রের গ্যাসের তুলনায় বেশ ঠান্ডাই বলা যায়। এই তাপমাত্রায় গ্যাসের মধ্যে কয়েক ধরনের পরমাণু তৈরি হতে পারে, কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন পাকড়াও করে তাদের বন্দি করে রেখে।

সমান নয়। স্থানভেদে তার রকমফের হয়—কোথাও বেশি কোথাও কম। সূর্যের বাইরের স্তরে যে সব অংশে এই চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি বেশি হয়, সেখানে চুম্বকের টানে গ্যাসের গতি আটকে যায়। সেখানকার তপ্ত গ্যাসকে ওপরে উঠতে দেয় না, আর তার ফলে ওই অংশে ভেতরকার উষ্ণতা বাইরে পৌঁছতে পারে না। যার জন্য ওই জায়গাগুলো কালো দেখায়।

চুম্বকের সঙ্গে সৌরকলঙ্কের যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে এটা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। সূর্যের গায়ে কলঙ্ক সব সময় জোড়ায় জোড়ায় দেখা দেয়। একটা দেখা গেলে সঙ্গে তার দোসরও থাকে। আর তাদের চৌম্বক ক্ষেত্রের মেরুও হয় উল্টোধর্মের—একটা উত্তর মেরুর হলে অন্যটা দক্ষিণ মেরুর হবেই। ঠিক যেমন আমরা চুম্বকের টুকরো দেখে অভ্যস্ত, যার দু'দিকে দুটো মেরু থাকে। চুম্বকের দুটো মেরুর মধ্যে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে। এবং সৌরকলঙ্কের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন।

স্কুলের পরীক্ষাগারে চুম্বকের চারিদিকে লোহার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে আমরা তার বলরেখা (লাইন অফ ফোর্স) আঁকি। এই গুঁড়োগুলো চুম্বকের শক্তির হেরফের অনুযায়ী নিজেদের সাজিয়ে নেয় বলে আমরা সহজে দেখতে পারি কোথায় এই শক্তি বেশি আর কোথায় কম। নাহলে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করা যায় না। সূর্যের গায়ে এই লোহার গুঁড়োর কাজ করে শক্তিশালী ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের মতো তড়িৎবাহী কণার ধর্মই হল চৌম্বক বলরেখা বেয়ে চলা। যখন সূর্যের ভেতরের গ্যাস ঝড়ের সঙ্গে বাইরে চলে আসে, তখন তার মধ্যে থাকা ইলেকট্রনগুলো সূর্যের গায়ের চৌম্বক বলরেখার পথ ধরে চলে। মাঝে মাঝে তারা এক জোড়া সৌরকলঙ্কের মধ্যে যে চৌম্বক বলরেখা রয়েছে সেই পথ বেয়ে ওঠানামা করে। এইরকম সময়ে ইলেকট্রন এক ধরনের অতিবেগুনি রশ্মি বিকিরণ করে। সম্প্রতি মহাকাশযান থেকে তোলা ছবিতে এই অতিবেগুনি রশ্মি পরিষ্কার দেখা গেছে এবং তার সাহায্যে সৌরকলঙ্কগুলোর মধ্যেকার চৌম্বকক্ষেত্রও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভোরের বেলা শিশিরের বিন্দু লেগে গাছের পাতার ফাঁকে লুকানো প্রায় অদৃশ্য মাকড়সার জালও যেমন আমাদের চোখে ধরা দেয়, এখানেও তার তুল্য একটা ঘটনা ঘটে। শিশিরবিন্দুর জায়গায় ইলেকট্রনগুলো আমাদের স্পষ্ট দেখিয়ে দেয় অদৃশ্য চৌম্বক বলরেখার ছবি।

যে-চৌম্বক শক্তি এই ভাবে সূর্যের বাইরের দিকে গ্যাসের কণাকে দৌড়ঝাঁপ করাচ্ছে, সেই শক্তির উৎপত্তি হচ্ছে সূর্যের গভীরে। তারপর গ্যাসের সঙ্গে সেই শক্তি বাইরের দিকে চলে আসছে। সূর্যের অন্দরমহলে যে অংশ থেকে গ্যাসের ঝড় উঠছে, সেই অঞ্চলে তৈরি চৌম্বক বলরেখাগুলো গ্যাসের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসছে। যেন নাভি থেকে উঠে আসছে এই হুঙ্কার ধ্বনি। আর বাইরে এসে সেই গ্যাসের কণাগুলোকে এদিক ওদিক এলোপাথাড়ি ছুড়ে ফেলছে।

সূর্যের গায়ে ওঠা ঝড় কখনও কখনও নিজেকে সামলাতে না পেরে সূর্যের বাইরে ছিটকে পড়ে। সূর্যের বাইরের দিকে এই উচ্ছল গ্যাসের দাপাদাপি প্রায়ই দেখা যায়, বিশেষ করে যখন সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্র শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই গ্যাসের মধ্যে যে কণাগুলোর গতিবেগ প্রচণ্ড বেশি, তারা মহাকাশে চতুর্দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়ে মেশিনগানের বুলেটের মতো। তার একটা অংশ পৃথিবীর গায়ে এসেও আছড়ে পড়ে। তখন পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র বেয়ে ঢুকে পড়ে বায়ুমণ্ডলে। এখানকার চৌম্বকক্ষেত্র উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর দিকে খুব শক্তিশালী, তাই সূর্য থেকে আসা পদার্থকণা ওই সব অঞ্চলে ঢুকে বাতাসের পরমাণুদের উত্তেজিত করে তোলে। পদার্থকণার এক একটা ঝাঁক এই ভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে চাবুক মারে। এদের গতিবেগ সেকেন্ডে হাজার কিলোমিটারের মতো। ঝাঁক ঝাঁক কণা এই প্রচণ্ড বেগে এসে আঘাত করে বায়ুমণ্ডলের পরমাণুর ওপর, আর তারা জ্বলে ওঠে মুহূর্তের জন্য—এই জন্যই দেখা দেয় মেরুপ্রভা, বা অরোরা বোরিয়ালিস আর অস্ট্রালিস। যখন সূর্যের গায়ে কলঙ্ক বেড়ে যায়, এবং তার চৌম্বক শক্তি হয়ে ওঠে উদ্ধত, তখন এখানেও মেরুপ্রভার ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায়।

সৌরকলঙ্কের হ্রাসবৃদ্ধি ধরা পড়েছে ২০০১ (ওপরে) ও ২০০৫-এ তোলা দু'টি ছবিতে

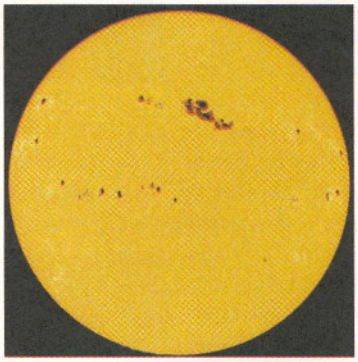

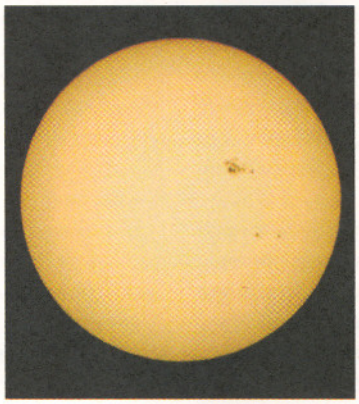

শুধু তাই নয়, এই শক্তিশালী পদার্থকণার ধাক্কায় অনেক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিও বিকল হয়ে যেতে পারে। মাঝে মাঝে যখন এই কণাগুলো বেশি সংখ্যায় ধেয়ে আসে, তখন তারা পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রে বেশ বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটায়, যাকে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর চৌম্বকঝড় বা জিওম্যাগনেটিক স্টর্ম বলেন। পৃথিবীর চারিদিকে পরিক্রমণরত কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর ওপরেও এদের প্রভাব পড়ে। অনেক সময় ওই সব উপগ্রহে রাখা যন্ত্রপাতিও খারাপ হয়ে যায়। ফলে স্যাটেলাইটের সাহায্যে যোগাযোগের ব্যাপারেও ব্যাঘাত ঘটে। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে সব বৈদ্যুতিক পাওয়ার গ্রিড রয়েছে, সেগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

১৮৫৯ সালে এমন একটা বিশাল চৌম্বক ঝড়ের প্রভাব টের পাওয়া গিয়েছিল এমনকী ভারত থেকেও। সেই বছর পয়লা সেপ্টেম্বর সূর্যে এমন এক ঝড় উঠেছিল, যা সূর্যের গায়ে দেখা যাওয়ার মাত্র আঠারো ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র তোলপাড় করে দেয়। মুম্বইয়ের কোলাবা মানমন্দিরের

হয়তো অনেকে ভাবছেন ঠাট্টা করা হচ্ছে। কলঙ্ক আবার কবে থেকে ভাল খবর হল? তা সে সূর্যেরই হোক আর কোনও লোকেরই হোক। তাছাড়া আজকাল কারও কলঙ্ক নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নাকি?

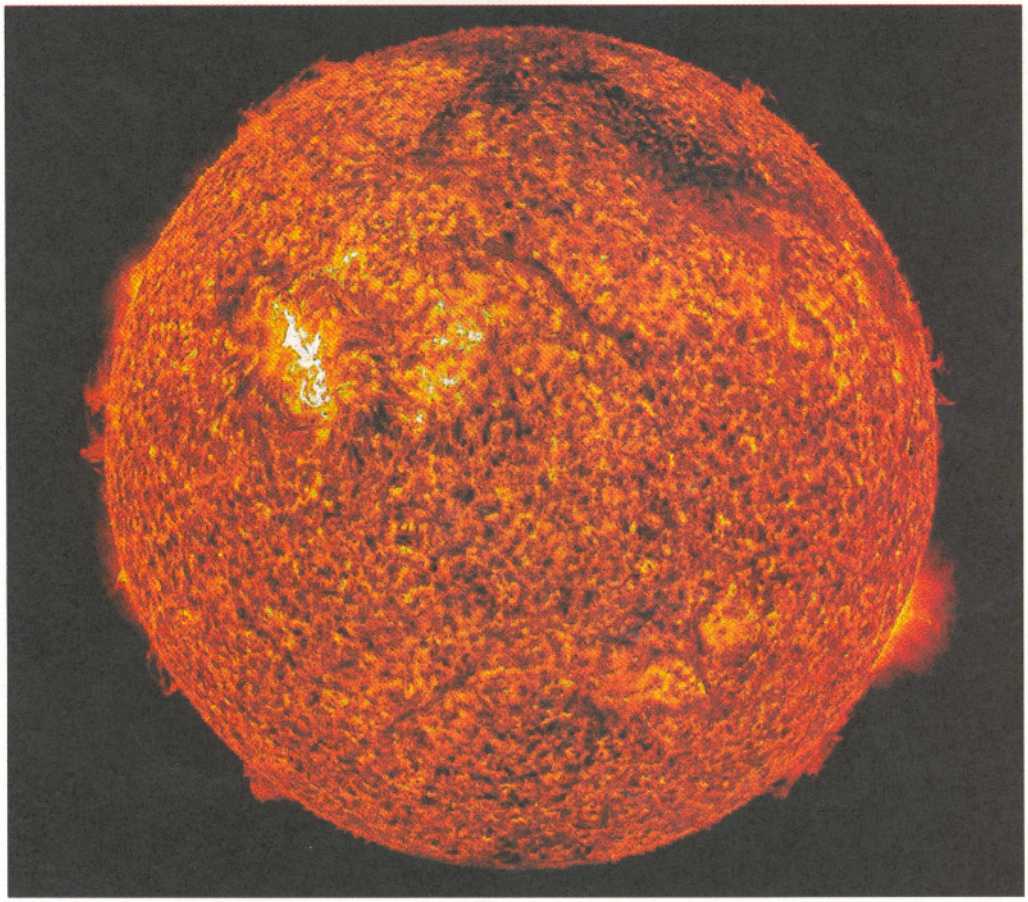

বিক্ষুব্ধ সূর্য। ৩ আগস্ট ২০১০। ওপরের কালচে অংশটি সূর্য থেকে ঠিকরে ওঠা পদার্থ, যার অভিঘাত অনতিবিলম্বে এসে পৌঁছেছিল পৃথিবীর বুকে

এই চৌম্বক ক্ষেত্র স্থির নয়—প্রতি মুহূর্তে এর পরিবর্তন হচ্ছে। কারণ ইলেকট্রনগুলোর গতিবিধি সব সময় বদলাচ্ছে। আর সূর্যের সব অংশে এই চৌম্বক শক্তির পরিমাণও সমান নয়।

পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সেখানকার চৌম্বকক্ষেত্রের শক্তি হঠাৎ সেদিন কমে গিয়েছিল। ১৯২১ এবং ১৯৬০ সালের ঝড়ের সময়েও সূর্য থেকে আসা শক্তিশালী পদার্থকণার সংখ্যা এমন বেড়ে গিয়েছিল যে তখন মেরু অঞ্চল থেকে অনেক দূরের জায়গাতেও মেরুপ্রভা দেখা গিয়েছিল, এমনকী শোনা যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপপুঞ্জ থেকেও। এছাড়া উত্তর আমেরিকা এবং কানাডায় বেশ কয়েকবার বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটেছিল।

আবার চৌম্বক ঝড় একেবারে কমে গেলেও যে খুব ভাল তা নয়। সূর্যের কলঙ্ক কমবেশি হওয়ার জন্য সূর্য থেকে বিকিরিত তাপও কমে এবং বাড়ে। যদিও এই পরিবর্তনটা খুব কম পরিমাণের, সাধারণত এক হাজার ভাগের এক অংশের মতো, কিন্তু এর ফল সামান্য নয়। যখন তাপ কমে যায়, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরের স্তর শীতল হয়ে কিছুটা সংকুচিত হয়ে আসে। এর ফলে কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর ওপর ঘর্ষণ বেড়ে যায়, যার জন্য তাদের কক্ষপথ যায় পাল্টে।

দেখতেই পাচ্ছি, সূর্যের গায়ে কলঙ্ক মোটেই সাদামাটা ব্যাপার নয়। এর ফল সুদূরপ্রসারী, এবং পৃথিবীতে আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রভাব পড়তে পারে। কয়েকজন বিজ্ঞানী এও বলেছেন যে, এর সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়ারও একটা সম্পর্ক আছে। এমন হতে পারে যে, সূর্য থেকে ছিটকে পড়া কণাগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে মেঘ তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে, বদলে দিতে পারে আবহাওয়া। তবে এই নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে, কথাটা কতটুকু সত্যি তা এখনও পুরোপুরি যাচাই হয়নি।

সূর্যের গায়ে কলঙ্কের সংখ্যা কিন্তু সব সময় এক থাকে না। এদের সংখ্যা কখনও বাড়ে আবার কখনও কমে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সৌরকলঙ্কের সংখ্যা একটা বিশেষ নিয়ম মেনে কমে আর বাড়ে। একবার এদের সংখ্যা কমে গিয়ে তার পর আবার বেড়ে আগের পর্যায়ে ফিরে আসে। এবং এর জন্য সময় নেয় প্রায় এগারো বছর। গত প্রায় দুশো বছরের পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞানীরা সৌরকলঙ্কের এই কমবেশি হওয়ার নিয়মটা খুঁজে পেয়েছেন। যেমন, ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে সূর্যের গায়ে কলঙ্কের সংখ্যা ছিল খুব বেশি—তখন সূর্যের গায়ে গড়ে প্রায় ১২০-টা দাগ দেখা গিয়েছিল। তার আগে ১৯৯৬ সালের মে মাসে এই সংখ্যা ছিল মোটে দশ। তারও আগে ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বরে গড়ে প্রায় প্রায় ১৫০-টা নতুন কলঙ্ক দেখা গিয়েছিল। এই ভাবে এগারো বছর পর পর সূর্যের কলঙ্কের সংখ্যা কমেছে এবং বেড়েছে। এ যেন সূর্যের একটা অভিশাপ—একবার কলঙ্ক মুছে গেলেও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না, তারা বারে বারে ফিরে আসে।

তবে এই নিয়ম একেবারে অলঙ্ঘনীয় নয়। যদিও গত দু'শো বছরে এর কোনও ব্যতিক্রম দেখা যায়নি, সপ্তদশ শতাব্দিতে একবার সূর্যের কলঙ্ক প্রায় উবে গিয়েছিল। হঠাৎ আশ্চর্য রকমে কমে গিয়েছিল কলঙ্কের সংখ্যা। তখন ভারতে দিল্লির মসনদে রাজত্ব করছেন আওরঙ্গজেব। ইউরোপে তখন ত্রিশ বছরের যুদ্ধ

> সূর্যের গায়ের এই দানাগুলো তার পুরো শরীরটা ঢেকে নেই। কিছু কিছু অংশে গ্যাসের এই ওঠানামা খানিকটা বন্ধ হয়ে থাকে। আটকে থাকে গ্যাসের গতিবিধি। সেই অংশগুলোতে একটা শক্তি কাজ করছে যার ফলে গ্যাস স্বাভাবিক ভাবে ওপরে উঠতে পারে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সূর্যের মধ্যে আবার চুম্বক কোথায়? কিন্তু একটু ভাবলেই ব্যাপারটা সহজ করে বোঝা যাবে। চুম্বকের সঙ্গে তড়িৎপ্রবাহের বা ইলেকট্রিক কারেন্টের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। এই দুই শক্তি একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কোথাও বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিবর্তন হলে সেখানে চৌম্বক শক্তি দেখা দেয়। আবার কোথাও চুম্বক নিয়ে নাড়াচাড়া করলে সেখানে ইলেকট্রিক কারেন্ট উঁকি মারে।

শেষ হওয়ার পর আবার তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধে নাকাল অবস্থা। এমন সময় হঠাৎ সূর্যের কলঙ্ক অর্ধেক শতাব্দির জন্য মুছে গিয়েছিল। পৃথিবীতে, বিশেষ করে ইউরোপে, তখন শীতের প্রকোপে লোকজনের নাজেহল অবস্থা। একটা ছোটখাটো তুষারযুগের মতন অবস্থা হয়েছিল তখন। যদিও সেরকম ঘটনা আর কখনও হয়নি, ১৯১৩ সালেও এবার সূর্যের কলঙ্ক ফিরে আসতে খুব দেরি হয়েছিল, যেমন এবার হয়েছে।

সম্প্রতি সূর্যের অবস্থা দেখে বিজ্ঞানীদের আবার সে সব ঘটনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল সব কিছু স্বাভাবিক নিয়মেই হচ্ছে, তারপর দেখা দিল গণ্ডগোল। ২০০১ সালে সূর্যের গায়ে কালো চিহ্নের ছড়াছড়ি ছিল, এবং তার পর এই নিয়ম মেনেই দাগের সংখ্যা কমে এসেছিল। ২০০৮ সাল নাগাদ সূর্য প্রায় কলঙ্কহীন হয়ে পড়েছিল। হিসেব মতো তারপর থেকে আবার তার সংখ্যা বাড়ার কথা। এতদিনে, অর্থাৎ ২০১০ সালের মাঝামাঝি এসে প্রায় একশোটার মতো কলঙ্ক দেখা দেওয়ার কথা। এবং ২০১২ সাল নাগাদ আবার তার অধিকতম পর্যায়ে ফিরে যাবার কথা—২০০১-এর এগারো বছর পর।

সৌরকলঙ্ক থাকে জোড় বেঁধে, চৌম্বকমেরুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

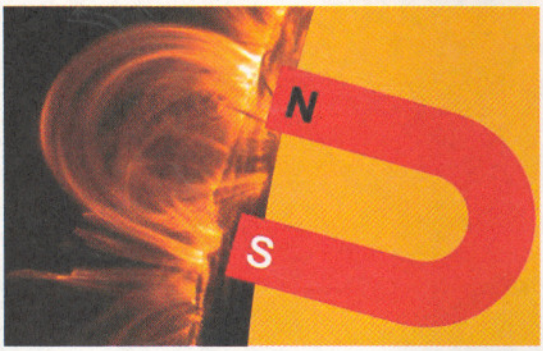

কিন্তু কোথায় সেই কলঙ্ক? গত দু'বছর ধরে বিজ্ঞানীরা তন্ন তন্ন করে সূর্যের গায়ে কলঙ্কের চিহ্ন খুঁজেছেন। কিন্তু ২০০৮ সালে প্রায় বেশির ভাগ দিনই সূর্যের গায়ে একটাও কলঙ্কের দাগ ছিল না। ২০০৯ সালেও প্রায় একই অবস্থা ছিল। ভাবুন একবার, কলঙ্ক নেই, আর সেজন্য লোকজনের মাথায় হাত।

সূর্যের কলঙ্ক এমন করে কমে আর বাড়ে কেন সেটাও একটা জরুরি প্রশ্ন। আর কেনই বা এমন নিয়ম করে এগারো বছর পর পর হয়? বিজ্ঞানীদের মতে এর উত্তর লুকিয়ে আছে সূর্যের গভীরে সেই স্তরে যেখান থেকে গ্যাস উঠে আসছে বাইরের দিকে। এর আসল কারণ হল সূর্যের নিজের চারিদিকে ঘোরার গতি সব জায়গায় সমান নয়। সূর্য যদিও তার অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরছে, তার ঘোরার সঙ্গে পৃথিবীর আহ্নিকগতির একটা বড় তফাত আছে। সূর্যের ঘোরার গতিবেগ তার সকল অক্ষাংশে সমান নয়—বিষুবরেখায় তার যে গতিবেগ, মেরুর কাছাকাছি গ্যাস তার চেয়ে ধীরে গতিতে চলে। এর জন্য সূর্যের ভেতরের দিকে চৌম্বক বলরেখার ওপর একটা টানাটানি চলে। বিভিন্ন অক্ষাংশের গ্যাস তাকে ভিন্ন গতিতে এক-একটা দিকে নিয়ে যেতে চায়। তার ফলে এই বলরেখাগুলো দুমড়ে গিয়ে পাকানো দড়ির মতো হয়ে যায়, আর তার কিছুটা অংশ সূর্যের গায়ের যে সব অঞ্চল ভেদ করে এই বলরেখার বান্ডিল (ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স টিউব) বেরিয়ে আসছে সেখানেই দেখা দেয় কলঙ্কের দাগ।

তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, সম্প্রতি সূর্যের গভীরে কোনও একটা ঘটনা ঘটেছে যার জন্য সূর্য তার স্বাভাবিক নিয়মে ব্রণসমেত কৈশোরোত্তীর্ণ চেহারা ফিরে পাচ্ছে না। এর সম্ভাব্য কারণ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে জল্পনাকল্পনা চলছে। ১৯৮০ সালে বিজ্ঞানীরা সূর্যের ভেতরে, প্রায় এক লক্ষ কিলোমিটার গভীরে, তপ্ত গ্যাসের এক ধরনের স্রোত আবিষ্কার করেছিলেন। এই স্রোত গ্যাসকে সূর্যের পূর্ব-পশ্চিমে, অর্থাৎ বিষুবরেখার সমান্তরালে একদিক থেকে অন্যদিকে নিয়ে যায়। প্রথমে মেরু অঞ্চলে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে এই ফল্গুস্রোত বিষুবরেখার দিকে চলে আসে। লক্ষ করে দেখা গেছে যে, এই গভীর স্রোত বিষুবরেখার কাছাকাছি পৌঁছলেই নীচে থেকে চৌম্বক বলরেখার বান্ডিল ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে। এই দুইয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধটা অবশ্য এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার নয়।

সূর্যের ভেতরের গ্যাসের এই ধরনের নড়াচড়ার খবর জোগাড় করার একটা সহজ উপায় আছে। পৃথিবীতে ভূমিকম্প হলে সেই কম্পনটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে যায়, যার ফলে পৃথিবীর এক প্রান্তের মাটির নড়াচড়ার কথা অনেক দূরে বসেও জানা যায়। ভূমির এই দোলন এক-একটা ঢেউয়ের

যে সব তারা সূর্যের চেয়ে অনেক ভারী এবং যাদের তাপমাত্রা খুব বেশি, তাদের বাইরের স্তরের গ্যাস আলোর কণাকে ভাল করে শুষে নিতে পারে না।

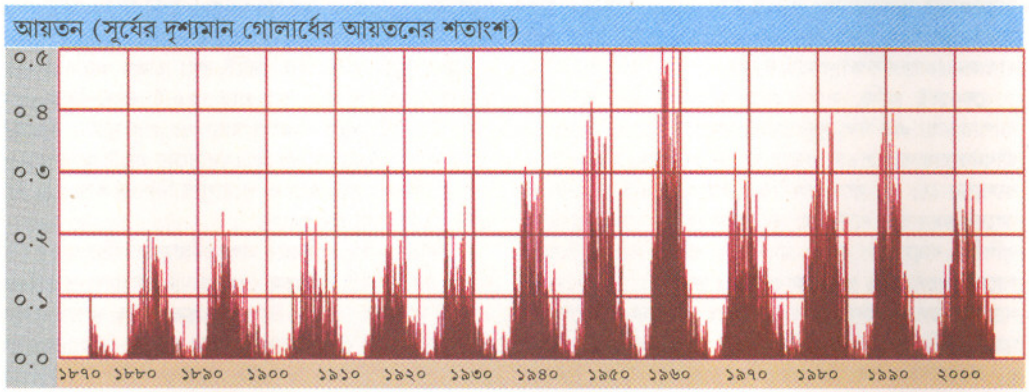

১৮৭০-এর দশক থেকে সৌরকলঙ্কের হ্রাসবৃদ্ধির রেখাচিত্র। গড়ে ১১ বছরের একটি চক্র এর থেকে স্পষ্ট হয়

সূর্যের বিক্ষোভ পৃথিবীতে সৃষ্টি করে মেরুপ্রভা

মতো মাটির মধ্য দিয়ে চলে, এবং পৃথিবীর ভেতরে এক-একটা অংশে ভিন্ন গতিতে চলে, কারণ দুটো ভিন্ন পদার্থের মধ্যে এই ঢেউয়ের গতি বিভিন্ন। ঠিক সেইরকম সূর্যের বাইরের স্তরেও সৌরকম্প হচ্ছে, এবং তাদের ঢেউ বিভিন্ন গতিতে সূর্যের বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এই সূক্ষ্ম সৌরকম্প পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার সাহায্যে সূর্যের ভেতরকার খবর জানার চেষ্টা করেন। এ জন্য পৃথিবীর নানা জায়গায় কয়েকটা বিশেষ টেলিস্কোপ বসানো হয়েছে, যার একটা রয়েছে আমাদের রাজস্থানে উদয়পুরে। এই সব যন্ত্র থেকে তথ্য জোগাড় করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে এবারকার সূর্যের ভেতরের ফল্গুস্রোত অন্যান্য বারের মতো তীব্র নয়। মেরু অঞ্চলে শুরু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিষুবরেখার কাছে আসতে তার অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগছে। তাই সূর্যের বাইরের স্তরে ঝড়ও তেমন জোরদার হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না কলঙ্কের ছোপ।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা ঝড় অবশ্য ২০০৮ সালে সূর্যের হঠাৎ নিষ্কলঙ্ক দশা দেখা যাওয়ার আগে থেকেই চালু হয়েছিল কলঙ্ক সৃষ্টির ব্যাপারটা নিয়ে। এর মধ্যে বিশেষ করে দুটো দলের বক্তব্য সাড়া জাগিয়েছে এবং এই দুই দলে দু'জন বাঙালি বিজ্ঞানী রয়েছেন।

বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর অধ্যাপক অর্ণব রায়চৌধুরী এবং বেজিঙ-এর চাইনিজ় অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স-এ গবেষণারত তাঁর সহকর্মীরা ২০০৭ সালে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁদের মতে ২০০৮ সালের পরে নতুন সৌরকলঙ্কের চক্রটা আগের বছরের তুলনায় কম শক্তিশালী হবে। অর্থাৎ কম সংখ্যক কলঙ্ক দেখা যাবে, এবং সূর্যের বাইরে ওঠা ঝড়গুলোও হবে দুর্বল। অন্যদিকে তাঁরই প্রাক্তন ছাত্রী মৌসুমী দিকপতি, যিনি বর্তমানে আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাটমস্ফেরিক রিসার্চ-এ গবেষণা করছেন, তাঁর এবং তাঁর সহকর্মী পিটার গিলম্যানের মতে এই পর্যায়ে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা আগের তুলনায় বেশি হবে, যদিও তাদের দেখা পেতে কিছুটা দেরি হতে পারে। অবশ্যই এই দুই দলের কষা অঙ্কের মধ্যে তফাত রয়েছে, যার মূলে আছে গ্যাস কীভাবে চৌম্বক

পদার্থকণার এক একটা ঝাঁক এসে আঘাত করে বায়ুমণ্ডলের পরমাণুর ওপর, আর তারা জ্বলে ওঠে মুহূর্তের জন্য। এই জন্যই দেখা দেয় মেরুপ্রভা। সূর্যের গায়ে যখন কলঙ্ক বাড়ে আর চৌম্বক শক্তি হয়ে ওঠে উদ্ধত, এখানেও মেরুপ্রভার ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায়।

বলরেখাকে টেনে নিয়ে যায় তার বিশদ বিবরণ সম্পর্কে এখনও অনেক অনিশ্চয়তা রয়েছে এবং তাঁরা দুই ধরনের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখেছেন। সত্যি বলতে কী, এই অনিয়মের দৌলতে সূর্যের কলঙ্কের হ্রাসবৃদ্ধির এই চক্রটার আসল কারণ খুঁজে বার করাটাই এখন বিজ্ঞানীদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজ্ঞানীদের এই সব প্রশ্নের মাঝখানে আবার একটা গুজব উঠেছে। সূর্যের কলঙ্কের সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়ার সম্পর্কটা কতটুকু সত্যি? এই যে গত শীতে ইউরোপে আর আমেরিকায় জাঁকিয়ে শীত পড়েছিল, তার জন্য কি গত দু'বছরের কলঙ্কহীন সূর্য দায়ী? তা যদি হয় তবে কলঙ্কহীন সূর্য কি আমাদের পৃথিবীকে উষ্ণায়নের আশঙ্কা থেকে রক্ষা করবে? এর সোজা উত্তর হল, সূর্যের কলঙ্ক আর ঝড় না থাকলে সূর্যের তেজ যদিও কিছুটা কমে যায়, সেটা আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট নয়। আর এই ভাবে পৃথিবীর উষ্ণায়ন বজায় রাখার অজুহাত খোঁজা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়।

এখন শুধু অপেক্ষার পালা। গত কয়েক মাসে আবার নতুন করে সূর্যের গায়ে কলঙ্ক দেখা যাচ্ছে। এদের সংখ্যা কি আগামী বছরে আরও বাড়বে, না ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে? আবার কি সেই সপ্তদশ শতাব্দীর মতো অবস্থা হবে, না ধীরে ধীরে সূর্যের ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য বাড়বে? আর যদি বাড়ে তাহলে অন্যান্য বছরের মতো জোরদার ঝড় উঠবে না কি সূর্য এবার হালকা ঝড় তুলেই কাজ সারবে? আসছে কয়েক বছরেই এই সব প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে।

লেখক বেঙ্গালুরুর রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত একজন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী

এমন হতে পারে যে, সূর্য থেকে ছিটকে পড়া কণাগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে মেঘ তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে, বদলে দিতে পারে আবহাওয়া।